প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

পরমহংসদেব ও অবতারবাদ : বেদান্ত থেকে বিজ্ঞান

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা জে.এন.এম.এস. মহাবিদ্যালয়

Abstract

In view point of science, Earth is moving around the sun and thus earth is helio-centric. In term of physics, Sun and earth are all the changed forms of matters. So, like various plant and animal, creation of human is also an ascertained result of material reflection and spontaneous change of inanimate world held in our universe over millions of years. In term of Vedanta the perpetual form of human development is also centralised by a supreme energy that named as many as God in different religion. So human development is dio-centric. As we all come from a single source of energy, there is no place in the new kind of physics both for the field and matter, for the field is only reality.

Swami Vivekananda as a devotee, in his 'aratrik stotra' worshiped his master Ramkrishna Paramhansadev and explained him there as a real founder and dedicated leader to all religion of the world. Swami Avedananda also explained him as a spotless, eternal soul descended in this earth ever before at many times in many forms to favour the people who were suffering differently from their different mortal pain. To his disciples Ramakrishna was a great saviour being worshiped as a descent of deity and proved himself as a part of God. The Kindness personified by him for the welfare of distressed people also proved that he was totally directed by almighty in the long run of his life to do the best and needful works for mankind. The great teacher Paramhansa Ramkrishnadev has told that if God is the real matter to know then other are not the real. In the other way, If we really meditate ourselves as a part of God only then we can discover our original reality. The person who told this has really felt so. And thus the doctrine of incarnation, achieved by the supreme grace of almighty was being started and reflects over thousands of people as the part of real humanity.

Key Words: Helio-centric, Dio-centric, Human Development, Doctrine, Incarnation, Ramkrishna, Humanity.

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক স্তোত্রে সকল ধর্মের সংস্থাপক ও স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বন্দনা করেছিলেন। আর এক গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ তাঁর প্রণাম মন্তে তাঁকে নিষ্কলঙ্ক, জন্মমৃত্যু রহিত অর্থাৎ নিত্য, শ্বাশ্বত (সনাতন), বহুরূপধারী, ভক্তগণকে অনুগৃহিত করবার জন্য নররূপধারী এবং পূজ্য ঈশ্বরের অবতার বলে বর্ণনা করেছেন (ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং/তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ)। স্বামী সারদানন্দের বর্ণনা থেকে জানা যায় ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী ঠাকুর যেদিন কল্পতরু হয়েছিলেন সেদিন থেকেই তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্যে এই সত্য প্রতিভাত হয়েছিল যে ঐদিন থেকে ঠাকুর নিজের দেবত্বের কথা তাঁর ভক্তবৃন্দ সমেত সংসারের কারো কাছেই আর লুক্কায়িত রাখবেন না এবং এখন থেকে পাপীতাপী সকলেই তাঁর অভয়পদে আশ্রয় লাভ করবে। বস্তুতঃ রামকৃষ্ণ সম্পর্কিত অবতারতত্ত্বের যাবতীয় ধারণার সূত্রপাতটি এখান থেকেই শুরু হয়। ('শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে'র ২য় ভাগ/'আত্মপ্রকাশে অভয়দান' শীর্ষক অধ্যায় : স্বামী সারদানন্দ দ্রষ্টব্য)।

মৃত্যুর পূর্বে ঠাকুরের কাছে দাঁড়িয়ে একদিন নরেন্দ্রনাথ নিজের মনকেই প্রশ্ন করেছিলেন 'ঠাকুর কি তবে সত্যই ভগবান?' ভক্তির দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তো সমগ্র বিশ্বই রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলে স্বীকার করবে। স্বয়ং ম্যাক্সমূলার তাঁকে 'মহাত্মা' বলেছিলেন। রঁম্যা রলাঁ বলেছিলেন : "তিনি তিরিশ কোটি মানুষের দুহাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণতা"। আর অরবিন্দের ভাষায় : "মানবদেহে ঈশ্বরের প্রকাশ"। তবুও তাঁকে 'অবতার রামকৃষ্ণ' নামে যত না ডাকা হয় তার থেকে তিনি অনেক কাছের হয়ে ওঠেন 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ' নামে। অনেকে তাঁকে 'প্রাণের ঠাকুর'ও বলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে যখন নরেন্দ্রনাথের মনে ঠাকুরের অবতারত্বের বিষয়ে প্রশ্ন জেগেছিল তখন অন্তর্যামী ঠাকুর তা যেন জেনে বুঝেই বলে উঠেছিলেন "এখনও তোর জ্ঞান হলো না? সত্যি বলছি, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ – তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই শেষের বলা কথা গুলি নিয়েই যত সংশয়। বৈদান্তিক বিবেকানন্দের সারা জীবনের সাধনার ফল 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' অথবা 'মানবের মধ্যে প্রসুপ্ত ঈশ্বর' বস্তুতঃ আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার বিস্তৃতি নিশ্চিত সাক্ষ্য দেয়। অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দৃষ্টিতে দেখলে যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর হবার সম্ভাবনা সর্বোত্তম তাদের মধ্যে রামকৃষ্ণকেই অন্যতম বলে মনে হয়।

যুগে যুগে যাঁদের আমরা অবতার পুরুষ বলে বর্ণনা করেছি তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের তুলনাক্রমে বিবেকানন্দ বলেছেন : "শঙ্করের বিচারশক্তি ও চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি এইবার একাধারে মূর্তিমতী হইল, আবার শ্রীকৃষ্ণের সর্বধর্ম-সমন্বয় বার্তা শোনা গেল, আবার দীন দরিদ্র পাপীতাপীর জন্য বুদ্ধদেবের ন্যায় একজন ক্রন্দন করিতেছেন, শোনা গেল; অবতারপুরুষগণ যেন অসম্পূর্ণ ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের পূর্ণ করিয়াছেন (fulfillment of all sages)" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : শ্রীম কথিত, পৃঃ ১০৯৩)। সুতরাং বিষ্ণুর দশাবতারের ন্যায় রামকৃষ্ণ একই দেহে সকল অবতারের পূর্ণ প্রতিরূপ বলা যায়।

রামকৃষ্ণের নিজের কথায় : "সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হয়ে আর বাহ্য থাকেনা। সে আর দেহরক্ষা করত পারেনা। ... ঈশ্বরকোটি – অবতারাদি – এই সমাধি অবস্থা থেকে নামতে পারে। তারা ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নামতে পারে।" আধুনিক কালের যুক্তিবিদরা হয়তো একেই বলবেন নিত্য থেকে লীলায় অবরোহন অথবা ভাব থেকে সাধনায় আরোহন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে অবতারতত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যায় সিলের Ecce Homo ভাবনা অনুসরণ করে বলেন : ঈশ্বর সংসারে নেমে এসে নবরূপ ধারণ করে অবতার রূপ নেন না, মানুষই আপনার সকল বৃত্তির সম্যক অনুশীলন ও তাদের সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ও তার ফল ঈশ্বরভক্তি ও মানব প্রীতিতে উৎসর্গ করলে অবতারত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ঈশ্বর অবতার রূপে মানব দেহে অবরোহণ করেন না বরং মানুষই তাঁর নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকোটির ধাপ অর্থাৎ সাধুতার পূর্ণ প্রকাশে অবতাররূপী মানবত্বে আরোহণ করে। প্রাচীন শাস্ত্র, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা, জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে অবতারকে প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরের অংশ বলা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেও কিন্তু দেবী চন্ডী বা মনসাকে ধরাধামে নেমে আসতে হয়েছে এই মানুষেরই কাছে পূজা পাওয়ার আশায়। আসল কথা মানবত্ব যদি দেবত্বের সমতূল্য হয় তবে দেবতাকেও গৌণ করে মানবের মানবত্বকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি জানাতে হয়। ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের স্থলে পশ্চিমী হিউম্যানিজমকে এভাবেই হয়তো একটা পৃথক মাত্রা দান করেছিলেন 'কৃষ্ণ' চরিত্রের রূপকার সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের 'নব্য মানবতা বাদ', অরবিন্দ যাকে বলেছিলেন Life Divine. রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাই ছিল 'মানুষের ধর্ম'।

অবতার লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয় আত্মা অবিনাশী। তা স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়। যে আত্মার অহংবোধ নাই, যা টাকাকড়ি, মান-সম্ভ্রম, ইন্দ্রিয় সুখ ইত্যাদি কিছুই চায় না, যার কাছে আমি বা আমার বলে কিছু নেই তিনিই অবতারত্বের লক্ষণ বিশিষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে বলতেন "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না, ঈশ্বরই বস্তু আর বাকী সব অবস্তু"। আমি কর্তা, আমার গৃহ-পরিবার এসকলই অজ্ঞান থেকে হয় । স্বামীজী আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে বলতেন : "আমাকে দেখিতেছ আর ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতেছ না? তিনি আর আমি যে এক। তিনি যে হৃদয় মধ্যে শুদ্ধ মনের গোচর।" মহাভারতের বাণী স্মরণ করলে দেখা যায় অবতারপুরুষ ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন অর্থাৎ মানবদেহ ধারণ করেছেন। খ্রীষ্টধর্মমতানুযায়ী অবতারগণ আমাদের পাপ মার্জনা ও মুক্তি দান করেন (vicarious atonement) যিশু খ্রীষ্টের ন্যায় দেশকালভেদে তাঁরা অবতীর্ণ হন। কিন্তু এ লেখনীর পূর্বসূত্র অনুসরণ করে আবারও বলা যায় সর্বক্ষেত্রেই নররূপধারী কল্পিত ও বন্দিত ঈশ্বররূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হন। এভাবেই বুদ্ধ, চৈতন্য, শংকরাচার্য – শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করেছেন। স্বামীজীর ভাষায় : "ঈশ্বরের স্বরূপ তুমি যতদূর পার কল্পনা করিতে পার; কিন্তু দেখিবে, তোমার কল্পিত ঈশ্বর, অবতারপুরুষ অপেক্ষা অনেক নিচু। তবে এই মানুষ দেবতাগুলিকে পূজা করা কি অন্যায়? তাঁহাদের পূজা করাতে কোন দোষ নাই। শুধু তাহা নহে, ঈশ্বরকে পূজা করিতে হইলে অবতারকেই পূজা করিতে হইবে। তুমি যে মানুষ, তোমার মানুষরূপী ভগবানকে পূজা করিতে হইবে, অন্য উপায় নাই।" ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে California প্রদেশে Los Angeles এ 'Christ the Messenger' শীর্ষক বিষয়ে স্বামীজী একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি অবতারতত্ত্বের বিষয়টি বিশদে উপস্থাপন করেছিলেন। স্বামীজীর কথা অনুসরণে বলা যায় অবতার পুরুষ মাত্রই 'in the son of God' রূপে প্রকাশিত। আমাদের ভিতরেও ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু অবতার পুরুষেই তাঁর বেশী প্রকাশ। আলোর স্পন্দন (Vibration of Light) সর্বস্থানেই প্রকাশিত কিন্তু বড় বড় দীপালোকেই অন্ধকার দূরীভূত হয়। আমেরিকায় অবস্থান কালে নারদ সূত্রাদি গ্রন্থ অবলম্বন করে লেখা স্বামীজীর ভক্তিযোগ গ্রন্থে তিনি বলেন : "অবতারগণ – স্পর্শ দ্বারা মানুষের চৈতন্য সম্পাদন করেন এবং যারা দুরাচারী, তারা পরম সাধুতে পরিণত হন" (অপ চেৎ সুদূরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক ব্যবসিতো হি সঃ)। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও কার্যবিধি লক্ষ্য করলে স্বামীজী বর্ণিত অবতারত্বের সকল লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলিরই সন্ধান মেলে। স্বামীজী রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক স্তোত্রটিতেও

রামকৃষ্ণ নির্গুণ সগুণ নিরঞ্জন জগদীশ্বর রূপে বন্দিত হয়েছে (খন্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়। নিরঞ্জন নররূপধর - নির্গুণ গুণময়।।)। গীতায় যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম সমন্বয় করেছিলেন তেমনই 'যত মত তত পথ' এর প্রবক্তা ঠাকুর রামকৃষ্ণ শিষ্য বিবেকানন্দের মাধ্যমে 'সর্বভূতস্থমাত্মানম্' অর্থাৎ ভগবান যে সর্বভূতে আছেন এ সত্যটিকে প্রথাগত ধর্মের উপর মানব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে (Earth is helio centric)। পদার্থের পরিভাষায় সূর্য, পৃথিবী সবই বস্তু। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জড়সত্তা তার ঐহিক বা জাগতিক সত্তার বিকাশ ও উন্নতিসাধন করেছে অবশ্যই বিজ্ঞানের হাত ধরে কিন্তু তার আবহমানকালব্যাপী অন্তর সত্তার বিকাশ তথা মানবসভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে (Human development is Dio-Centric)। অন্ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণের মত ও বাণী পড়লে তাই মনে হয়, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন 'ঈশ্বরই বস্তু, বাকী সব অবস্তু'। এটি নিছক ধর্মের কথা নয়, কারণ আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্য হলো এই যে, আমাদের সকল কিছুরই ক্ষেত্র বা উৎস হলো এক অর্থাৎ সকল পদার্থ ও বস্তু একক উৎস থেকে আগত। আইনস্টাইন বলেছিলেন : "There is no place in this new kind of physics both for the field and matter, for the field is the only reality". এর সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা field theory (ক্ষেত্র তত্ত্ব)-কে যদি এক করা যায় তবে দেখা যাবে যে পদার্থ, তা যত আনুবীক্ষণিক, পারমানবিক, চৌম্বকীয় বা মহাজাগতিকই হোক্ না কেন তার মূল ঐক্য বা রূপের অনিত্যতা অভিন্ন। প্রতিটি পদার্থই তার আভ্যন্তরীণ তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে অজস্র অনু-পরমাণুর কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণে ঘূর্ণায়মান রূপেরই বাস্তব ফলশ্রুতি। পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপাবয়ব বিশিষ্ট হলেও গঠনকারী অনু-পরমানুর রূপের অভিন্নতা তাদের একই ক্ষেত্র হতে সৃষ্টির প্রমাণ দেয়। আবার একটি টেবিলকে যদি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন নিত্য ঘূর্ণায়মান বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রের সমষ্টিরূপে দেখি তবে তা যে আমাদের মানব মনের ক্রিয়ারই বাস্তব প্রতিরূপ তা আর অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ পদার্থের মূল অস্তিত্ব আমাদের মনের ক্রিয়ারই বাস্তব প্রতিফলন একথা বলা যায়। চিন্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বিভিন্ন পদার্থকে বিভিন্ন অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে তোলে মানুষের মন। সুতরাং যে অনুভূতির আলোকে দ্রষ্ঠা অনিত্য বস্তু হিসাবে টেবিলকে দেখে সেই দ্রষ্টাই আবার তার মরমী কল্পনা বা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করে। দার্শনিক কান্ট জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় (phenomenon and non-phenomenon)-এর পার্থক্য জানতেন। রাসেলের মতে সকল বস্তুজগতের মৌল উপাদান হলো Sensedata আর বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক-এর আত্মজীবনীতে আবিষ্কারী বিজ্ঞানীর মনের শক্তি বা Creative Imagination কে স্বীকার করা হয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নততর যন্ত্র আজ মানুষের অন্তর চৈতন্যের প্রসারণ ও অন্তঃশক্তির প্রভাবও যে একদিন বিবর্তনের পথে সাহায্য করেছিল সে সম্পর্কে বৃহত্তর আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে, তারই নিরলস তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে।

উপনিষদ বলে সৃষ্টির আদিতে তিনি এক, অন্তেও এক। মান্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মার অবিনাশত্ব ও ব্রহ্মের একত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। 'অয়মাত্মাব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি' অথবা 'সোহমস্মি' তত্ত্ব গুলি এভাবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অব্যাকৃত মায়ায় অগোচর এবং তাকে অতিক্রম করে ব্রহ্ম স্বরূপকে জানতে গেলে সাধনার প্রয়োজন। ব্রহ্ম অব্রণ, অদৃশ্য, অগন্ধ, অগ্রাহ্য, অনিত্য ও অস্পর্শ এ কথা বলেছে উপনিষদের নেতিবাদ আবার ইতিবাচক অর্থে কঠ বলেছেন ব্রহ্ম শাশ্বত, সত্য, নিত্য - সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মাতিত - মহান থেকে মহীয়ান। এই ব্রহ্মকেই স্বামী বিবেকানন্দ 'সর্বজীবের অন্তরাত্মা' বলে উপলব্ধি করেছেন (সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট)। আদিতে এই ব্রহ্মের উৎপত্তি শূন্য থেকে। বৌদ্ধতন্ত্রেও এ শূন্যবাদের কথা বলা হয়েছে (মহাযানতন্ত্র)। তবে এ শূন্যবাদ নাস্তিক নয় বরং তা জীবনের উৎস। সুদূর মহাশূন্যে অবস্থিত অজস্র মহাজাগতিক আলোকবিন্দুর গতিচঞ্চল নিরন্তর উদ্ভাস ও বিলুপ্তি মহাজাগতিক শক্তিরই (Energy) অনন্ত বিচ্ছুরণ। কাপরার ভাষায় : "The phenomental manifestation of the mystical void, like the subatomic particles, are not static and permanent, but dynamic and transitory, coming into being and vanishing in on ceaseless dance and movement and energy." বৈদান্তিকেরা এই মহাজাগতিক লীলাকে নিজেদের নিরলস সাধনা দ্বারা অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন ও সেখান থেকেই ব্রহ্মের স্বরূপ ও সত্যানুসন্ধান করেছিলেন। অধীত এই ব্রহ্মজ্ঞানকেই পরবর্তীতে যাঁরা মানবের অন্তঃসত্তার সঙ্গে একীভূত করে তুলেছিলেন ও বলেছিলেন 'জীব সেবাই শিব সেবা', তাঁদের মধ্যেই অন্যতম হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

দ্বৈত এবং অদ্বৈতপন্থী বেদান্ত, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ব্রহ্মবাদকে বৈজ্ঞানিক মতবাদাদির প্রায় সমধর্মী করে তুলেছে। গীতার 'কর্মযোগ' চৈতন্যাশ্রিত প্রেম ভক্তিবাদে (রাগানুগা) এসে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, প্রেম ও যোগের মধ্যে এক মহা সমন্বয় সাধন করলেন। সকল পথে সকল মতেই ব্রহ্মস্বাদী আকুলতা ভক্তিকে করে তুললো অকুল পাথার। বিজ্ঞানীরা দেশ-কাল অথবা বস্তু জগতের মৌল উপাদানের স্বরূপ সন্ধানে যে বুদ্ধিগ্রাহ্যতার অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্বের প্রশ্নে এসে থমকে দাঁড়ালেন, সেখান থেকেই যেন শুরু হলো শ্রীরামকৃষ্ণের বাগ্ময় উক্তি : 'বোধে বোধ' অর্থাৎ যাকে বুঝতে বুদ্ধিগ্রাহ্যতার অধিগম্য অতলে প্রবেশ করতে হয় তাই বোধী আর তার নির্মাণ শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়, তৈরী হয় বোধ দিয়ে। এই বোধী হলেন ঈশ্বর আর তাঁকে পেতে গেলে বিশ্বাসের তরুতে আরোহণ করতে হয়। সেই বোধীবৃক্ষ হলো "উর্ধ্বমূল : অবাক্ শাখ : এষোহশ্বত্থ সনাতনঃ" (কঠোপনিষদ), যাকে জন বলেছেন "grows form above downwards, for its roots are in Godhead". শ্রীরামকৃষ্ণের নির্বিকল্প সমাধি বা ভাবসমাধি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর উপায় - আবৃত চক্ষুর অন্তরালে যে 'Devine Darkness' তার মধ্যে দিয়েই 'flight of the alone to the alone' ও অমৃতত্ত্ব লাভের প্রয়াস। উপনিষদ অনুসরণে করে যাকে বলা যায় চৈতন্য অবগাহন। রামকৃষ্ণের ভাষায় : "জীবজগৎকে ছেড়ে প্রথমে সচ্চিদানন্দে পৌঁছাতে হয়; তারপর দ্যাখে যি তিনিই এই সব জীব জগৎ হয়েছেন। ... অনুলোম, বিলোম। ভক্ত সবই লয়।" রঁম্যা রলাঁ একেই বলেছেন :

"realize that the Cosmic Ego, wherein are born the infinite modes of the universe, is within thee; at every moment of the life, see and do good in the world". রামকৃষ্ণের ভগবৎচেতনা যে আসলে মানুষের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের অভিমুখী রঁম্যা রলাঁর এই কথাতেই তার প্রমাণ মেলে। সাধনায় অহমের জ্ঞান সম্পূর্ণ ছেড়োনা, নিরাকারের সাথে মিলনের আনন্দে সম্পূর্ণ ডুবে যেওনা কারণ চেতনার রাজ্যে আছে অজস্র মানুষ, যারা সাধকের সাধনালব্ধ ঈশ্বর ভক্তির ফল পেতে উন্মুখ। এ যেন স্বর্গোদ্যান থেকে কুসুম চয়ন করে পৃথিবীর মনুষ্য উপবনকে সুগন্ধিত ও কুসুমিত করে তোলা। রামকৃষ্ণের অবতারত্বের ও অসাধারণত্বের এ আর এক লক্ষণ। সহজ জ্ঞানে, সাদা-মাটা ভাষায় লোক শিক্ষা দান। ঈশ্বরকেও চাই আবার মনুষ্যলোক থেকে সর্বনির্লুপ্তি ঘটিয়ে বৈরাগ্য সাধন নয়, অর্থাৎ লোকশিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাকা – এই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎ চেতনার সহজ শিক্ষা। একবার ঈশ্বরে আরোহন – আবার মায়ার জগতে অবরোহন। এভাবে নিরন্তর চেতনার আসা-যাওয়া। তাঁর শিক্ষা – ঈশ্বরের আলাদা আলাদা নাম হলেও তাঁকে পেতে গেলে ব্যাকুল ডাকতে হবে। বিবেক, ত্যাগ, বৈরাগ্য অবলম্বন করে তাঁকে ব্যাকুল ভাবে ডাকলে একসময় ঠিকই পাওয়া যায়।

বিবর্তনের ধারায় ঈশ্বরচেতনা ও বিজ্ঞান একই সমান্তরাল ক্ষেত্রে এসে দাঁড়ায় যখন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে পাই ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদত্বকে। ব্রহ্ম সকল সৃষ্টিকে ব্যক্ত করে আছে একথা উপনিষদের সত্য (ঈশাবাস্য মিদং সর্বম), আর রামকৃষ্ণের কথায় : অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির ন্যায়, দুগ্ধ ও তার ধবলত্বের ন্যায় ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অকৃত্রিম। একটি কার্য হলে অন্যে তার কারণ। যখন তিনি নিত্য তখন নিষ্ক্রিয় আর যখন তিনি লীলায় তখন তার প্রকাশ অবতারত্বে। সাপের উপমাতে অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে এই রামকৃষ্ণাশ্রিত ভাবনা। মায়াকে শংকর বলেছেন ভ্রম, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। আর রমকৃষ্ণের কথায় মায়া চিরস্থির – ব্রহ্মেরই চলিষ্ণুতা, ক্রিয়াশীল রূপ। সত্য জগৎ অব্যক্ত ব্রহ্মেরই প্রকাশ। জ্ঞান হলো সূর্য আর চেতনা হলো বরফ। জ্ঞান সূর্যের আলোয় চেতনার বরফ গলে জল হয় আর সেই ভক্তির জলে হৃদয় রাজ্যে প্রতিষ্টিত হয় শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম – যার জাগতিক বহিঃপ্রকাশ মানবপ্রেমে উত্তরণ।

মানবপ্রেমিক রামকৃষ্ণের মতবাদ আবার তথাকথিত পশ্চিমী মানবতাবাদ থেকে আলাদা বরং ভারতীয় যুক্তিবাদী মানবতাবাদের অনেক কাছের, যেখানে দেশ-কালের উর্ধে মানুষ ও মনুষ্যত্বকে বৃহত্তর মর্যাদা দান করা হয়েছে। পশ্চিমী ভোগবাদকে সমালোচনা করেছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও, কারণ সেখানে মানুষকে ধনতান্ত্রিক উপাদানেরই আর এক ফল হিসাবে দেখানো হয়েছে। কথামৃতের রামকৃষ্ণের ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতীক, ভারতবর্ষের মতো দেশের বুকে অনেক বেশী সনাতন। আবার তিনি শুধুই প্রগতিপন্থী সমাজ সংস্কারক নন, বরং যুক্তির গন্ডীতে আবদ্ধ থেকে স্বয়ং ঈশ্বরকেও প্রামাণ্য সত্য হলে তবেই গ্রহণীয় এ মতেরই ভাষ্যকার শিষ্য নরেন্দ্রনাথের কাছে। অনেকের মতে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ঘটেছিল তাঁর আগমনে, কিন্তু তাঁর জীবন ও বাণী অনুসরণ করলে আমরা দেখবো যে আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ কোনো নির্দিষ্ট জাতি-ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নন, তিনি সকল সম্প্রদায়ের, সব মানুষের।

তথ্যসূত্র :

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : শ্রীম কথিত
২। সবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অব্ কালচার
৩। বেদান্ত দর্শন : স্বামী অভেদানন্দ
৪। ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য : মণি ভৌমিক
৫। ধর্ম, দিব্যানুভূতি ও ঈশ্বর : স্বামী অভেদানন্দ
৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা

*****